

সামাজিক গবেষণায় প্রতিবেদন লিখন : পদ্ধতি ও কৌশল

রহমত আলী-ছিদ্দিকী *

Abstract : The method and technique of writing a research report in social research are very significant. In this article the methods and techniques of writing a research report have been discussed systematically. At the very beginning of the article, some light has been flashed on considering the factor for writing a research report. Essential sections generally included in a perfect social research report and their characteristics have been elaborated critically in this article. Later on characteristics of a perfect research report have been discussed And some recommendations have been put-up at the end of the article in order to ensure the proper shape of social research report.

ভূমিকা

বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ তাঁদের জীবনের নানা প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। উদ্দেশ্যানুযায়ী বিভিন্ন প্রতিবেদন বিভিন্ন লক্ষ্যে প্রণীত হয় বিধায় উপস্থাপনা ও কাঠামোর দিক দিয়ে তাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য সূচিত হয়। একজন সংবাদিক সংঘটিত কোন বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে তা প্রতিবেদন আকারে সংবাদপত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারেন, কোন পুলিশ অফিসার কোন ঘটনার তদন্ত করে তার রিপোর্ট পেশ করে থাকেন এবং বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা প্রতি অর্থবছর শেষে বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করে থাকে। এসব প্রতিবেদন লেখার পদ্ধতি এক রকম

* সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

নয় এবং তা সব সময় সবার জন্য লেখা হয় না। বিশেষ বিশেষ প্রতিবেদনের জন্য বিশেষ বিশেষ ধরনের পাঠক নির্ধারিত থাকে। তাই প্রতিবেদন লেখার সময় সেই বিশেষ পাঠকের উপযোগী করে তা তৈরী করা হয়। তবে একথা সত্য যে, সব প্রতিবেদনেরই উদ্দেশ্য হ'ল তথ্য প্রকাশ করা। সংগৃহীত তথ্য এবং লেখকের স্বীয় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সংমিশ্রনে এই প্রতিবেদন একটি বিশেষ সৃষ্টিতে পরিনত হয়। তাই নতুন জ্ঞান ও তত্ত্ব প্রকাশ করার পাশাপাশি বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

গবেষক তাঁর গবেষণার বিষয় সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ব্যাপক অনুসন্ধান পরিচালনার পর সংগৃহীত তথ্য ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিবেদন তৈরীর কাজে মনোযোগ দেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রতিবেদন তৈরীর কাজটি তাঁর কাছে অত্যন্ত প্রত্যাশিত ও আনন্দদায়ক। দীর্ঘ দিন যাবত অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচুর অর্থ ব্যয় শেষে তিনি যা লাভ করেন তা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে চান প্রতিবেদনরূপে। কোন গবেষণার ফলাফল যত মূল্যবানই হোক না কেন, তা সংশ্লিষ্ট পাঠকের সামনে যথার্থরূপে তুলে ধরতে না পারলে কেউই তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে না এবং নতুন জ্ঞান হিসেবে তা স্বীকৃতি লাভ করে না বা জ্ঞানের প্রসার সম্ভব হয় না। প্রতিবেদন হচ্ছে গবেষণার সর্বশেষ ধাপ যার মাধ্যমে গবেষণার ফলাফল ও সিদ্ধান্ত আগ্রহী পাঠকবৃন্দের কাছে এসে পৌঁছে, প্রতিবেদনের গুরুত্ব তাই অপরিসীম। নতুন সৃষ্টির আনন্দ জড়িত থাকলেও প্রতিবেদন তৈরীর কাজটি কিন্তু একেবারেই সহজসাধ্য নয়। সংশ্লিষ্ট পাঠকবৃন্দের উপযোগী করে একটি যথার্থ প্রতিবেদন লিখতে যথেষ্ট জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্যের দরকার হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একই বিষয়ে পরিচালিত অনুসন্ধানের উপর তৈরীকৃত প্রতিবেদন গবেষকভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কোনটি পাঠক মনে আবেদন সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়; আবার কোনটি পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করে। প্রকৃতপক্ষে প্রতিবেদন লিখন একটি কলা বিশেষ। তাই একই ঘটনার উপর পরিচালিত অনুসন্ধানের প্রতিবেদন গবেষকভেদে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। প্রতিবেদনের উপর্যুক্ত বিষয়কে বিবেচনায় রেখে বর্তমান প্রবন্ধটিতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করা হয়েছে :

- ক. সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষণা প্রতিবেদনের স্বকীয় ধরণ নিরূপণ
- খ. গবেষণা প্রতিবেদনের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ চিহ্নিতকরণ
- গ. উত্তম প্রতিবেদনের মৌলিক ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ
- ঘ. গবেষণা প্রতিবেদনের কাঠামো বিশ্লেষণ এবং
- ঙ. যথার্থ প্রতিবেদনের স্বরূপ নিরূপণ সংক্রান্ত সুপারিশমালা প্রণয়ন।

প্রবন্ধে ব্যবহৃত পদ্ধতি

বর্তমান প্রবন্ধটি সম্পূর্ণরূপে একটি তত্ত্ব ও তথ্য ভিত্তিক কর্মের ফসল। তাই সংগত কারনেই এটি মাধ্যমিক (Secondary) অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত তত্ত্ব ও তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রে লেখকের স্বীয় অভিজ্ঞতা এবং দেশের বরণ্য সমাজ গবেষকদের সাথে অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাতকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য এখানে সংযোজিত হয়েছে। তাই বলা যায় মাধ্যমিক অনুসন্ধানের পাশাপাশি কিঞ্চিৎ হলেও প্রাথমিক (Primary) অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত কিছু তথ্য প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে। মূলতঃ এটি একটি Desk Research, যাকে গবেষণা পদ্ধতির দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Content Analysis Method) হিসেবেও আখ্যায়িত করা চলে।

প্রতিবেদন লেখার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়

গবেষণা প্রতিবেদন তৈরীর ক্ষেত্রে যে বিষয়টির প্রতি সর্বাধিক নজর দিতে হবে তা হ'ল প্রতিবেদনটি কোন শ্রেণীর ব্যবহারকারীর উদ্দেশ্যে লিখিত হবে। যদি প্রতিবেদনটি সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী বা গবেষকদের জন্য লেখা হয় তবে তা যে অবয়বে হবে, সর্বসাধারণের জন্য লেখলে তা অবশ্যই ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করবে। অর্থাৎ প্রতিবেদনের ধরণ তার পাঠক দ্বারা নিশ্চিত হয়। তবে একথা সত্য যে, প্রতিবেদন সাধারণ মানুষের জন্যই লেখা হোক বা বিশেষ জনসমষ্টির জন্যই লেখা হোক, তা লেখার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয় দুটির প্রতি বিশেষ যত্নবান থাকতে হবেঃ

- কি তথ্যাবলী পরিবেশন করা প্রয়োজন?
- কিভাবে তার সর্বাধিক উত্তম পরিবেশনা নিশ্চিত করা যায়?

প্রতিবেদনের ধরন

উদ্দেশ্য দ্বারা প্রতিবেদন দারুনভাবে প্রভাবিত হয়। প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্যের উপরই প্রতিবেদনের প্রকৃতি নির্ভরশীল। সব প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য পাঠকবৃন্দের নিকট তথ্য সরবরাহ করা হ'লেও গবেষণার প্রতিবেদন আর পুলিশ অফিসার বা সাংবাদিকের প্রতিবেদন কোনক্রমেই এক নয়। কারণ তারা নিজস্ব উদ্দেশ্য, প্রকৃতি ও আকৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন। উদ্দেশ্যের দৃষ্টিকোণ ও প্রকৃতির দিক বিচারে প্রতিবেদনকে নিম্নলিখিত দু'ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

- তথ্যমূলক প্রতিবেদন (এতে ঘটনার বর্ণনা ছাড়া বিশ্লেষণ, তাৎপর্য ব্যাখ্যা, সুপারিশমালা ইত্যাদি নাও থাকতে পারে)।
- গবেষণার প্রতিবেদন (এতে তথ্যের বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও সুপারিশমালা থাকে-যার সাহায্যে বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান করা সম্ভবপর হয়)।

এ প্রবন্ধে গবেষণা প্রতিবেদনই মূখ্য আলোচ্য বিষয়। গবেষণা প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সমস্যা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর সংক্ষিপ্ত ও পদ্ধতিগত রূপ। সংগৃহীত তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণের পর গবেষক তাঁর গবেষণার ফলাফল পাঠকের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য নির্দিষ্ট পন্থায় তা প্রতিবেদন আকারে লিপিবদ্ধ করেন। তাই গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়সমূহের মধ্যে 'প্রতিবেদন লিখন' পর্যায়টি বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্য বহন করে। কারণ প্রতিবেদনের লক্ষ্য হ'ল বিস্তারিত তথ্য সংক্ষিপ্ত ফলাফল আকারে এমন সুশৃঙ্খল ও সুসংবদ্ধভাবে প্রকাশ করা-যাতে পাঠকবৃন্দ গবেষকের কোন প্রকার সাহায্য ছাড়াই উপস্থাপিত তথ্যসমূহ এবং গবেষণার ফলাফলের তাৎপর্য ও ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে।

প্রতিবেদন প্রণয়নের সময় প্রতিবেদনটির পাঠক করা হবেন সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি

রাখতে হবে। কারণ গবেষণা প্রতিবেদন বিশেষ এক শ্রেণীর পাঠকের উদ্দেশ্যে প্রণীত হয় যেখানে পাঠকের শিক্ষাগত যোগ্যতা, মননশীলতা, আগ্রহ ইত্যাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অতি যত্নসহকারে বিবেচনায় রাখা হয়। গবেষণার উদ্দেশ্যানুযায়ী প্রতিবেদন সাধারণতঃ তিন ধরনের হয়ে থাকে^৬। যেমন :

- ক. বিশদ বা বিস্তৃত প্রতিবেদন (যেমন, থিসিস)
- খ. মাঝারি আকারের প্রতিবেদন (যেমন, কোন জার্নালে প্রকাশের উদ্দেশ্যে তৈরীকৃত গবেষণামূলক প্রবন্ধ) এবং
- গ. সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন (যেমন, গবেষণার সার সংকলন)

প্রতিবেদনের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ

কোন সামাজিক গবেষণা পরিচালনা শেষে তার একটি বিজ্ঞানসম্মত প্রতিবেদন লেখার জন্য তেমন কোন সুনির্দিষ্ট ও ধরাবাঁধা রীতি প্রচলিত নেই। গবেষণার উদ্দেশ্য ভেদে এর লিখন পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। তবে সাধারণতঃ একটি গবেষণা প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকে^৭ :

- ক. গবেষণা সমীক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান এবং তাত্ত্বিক গবেষণার সম্পর্ক বিশ্লেষণ
- খ. গবেষণা নকশা ও উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল বর্ণনা
- গ. গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা
- ঘ. তথ্যের উৎসসমূহ উল্লেখ করা
- ঙ. গবেষণার বিষয়-পরিধি (Scope) নিরূপণ
- চ. গবেষণার কার্যকর উপপ্রমেয় (Hypothesis) সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান
- ছ. গবেষণায় ব্যবহৃত কলাকৌশল ও পদ্ধতিসমূহের বর্ণনা প্রদান
- জ. সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ ও গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন
- ঝ. উপপ্রমেয় চাইয়ের ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা
- এং. প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উপসংহার টানা এবং প্রায়োগিক তাৎপর্য নির্দেশ করা

ট. বিশেষ মন্তব্য প্রদান এবং

ঠ. পরিশিষ্ট (নমুনা, প্রশ্নমালা, নমুনা সাক্ষাৎকার প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে) প্রদান।

সমাজ বিজ্ঞানী মার্গারেট স্টাসি (Margaret Stacy, 1979)-এর মতানুসারে গবেষণা প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিতঃ

- কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থানুকূলে কে বা কারা গবেষণাটি পরিচালনা করছেন তার বর্ণনা গবেষণায় উল্লেখ করা
- গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা
- গবেষণার শুরু ও সমাপ্তি কালের উল্লেখ করা
- জনগোষ্ঠীর বৃত্তান্ত, নমুনা আকার এবং নমুনায়ন পদ্ধতির স্পষ্ট বর্ণনা সন্নিবেশিত করা
- গবেষণা পরিচালক, সহকারী ও মাঠ কর্মীদের প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী প্রতিবেদনে সংযুক্ত করা
- তথ্য সংগ্রহের কলাকৌশল ও উপকরনাদির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
- গবেষণার ফলাফল কি হ'ল তার বিবরণ
- উপপ্রমেয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ ও অসংঘতিপূর্ণ তথ্যাবলীর বিবরণ
- গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে অনুরূপ অন্যান্য গবেষণার ফলাফলের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও সম্পর্ক নির্ণয় এবং
- গবেষণালব্ধ ফলাফলের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক তাৎপর্যের বিশ্লেষণ।

প্রতিবেদন লিখন পদ্ধতি নিয়ে সমাজ বিজ্ঞানীরাও একমত হতে পারেননি। এতেই প্রমানিত হয় প্রতিবেদন লিখন একটি অত্যন্ত জটিল ও বেশ শক্ত কাজ। তবে উপরোল্লিখিত বিষয়সমূহ অনুসরণ করে প্রতিবেদন তৈরী করলে তা একটি যথার্থ প্রতিবেদনের রূপ ধারণ করবে বলে আশা করা যায়। এখানে আরো

উল্লেখ্য একটি যথার্থ প্রতিবেদন লিখনের ক্ষেত্রে একজন গবেষকের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্যের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

উত্তম প্রতিবেদনের বৈশিষ্ট্যাবলী

হ্যান্স রাজ (Hans Raj, 1979)-এর মতানুসারে একটি মানসম্পন্ন গবেষণা প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত মৌলিক ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যসমূহ থাকা বাঞ্ছনীয়ঃ

(ক) স্পষ্ট চিন্তা

গবেষক দ্ব্যর্থহীনভাবে ও পরিষ্কার ভাষায় তাঁর অনুসন্ধানলব্ধ জ্ঞান প্রতিবেদনে উপস্থাপন করবেন, যাতে আগ্রহী পাঠকবৃন্দের পক্ষে বক্তব্য বুঝতে কোন প্রকার অসুবিধা বা জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হতে না হয়। গবেষণার ফলাফলে মৌলিকত্ব থাকতে হবে। মৌলিকত্বের অভাবে গবেষণা জ্ঞানের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে ব্যর্থ হয়^৮। অপরপক্ষে নতুন তথ্য ও তত্ত্ব সম্বলিত গবেষণা ফলাফল জ্ঞানের জগতে নতুন মাত্রা সংযোজন করে।

(খ) স্বচ্ছ ধারণা ও পদ

গবেষণা প্রতিবেদনে ব্যবহৃত ধারণা ও পদসমূহ সুস্পষ্ট হতে হবে। ব্যবহৃত ধারণা ও পদসমূহ দ্ব্যর্থহীন করার জন্য যথার্থ সংজ্ঞা প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে সুস্পষ্ট করতে হবে যাতে বিশেষ অর্থে ব্যবহার ছাড়া কেউ অন্য কোন অর্থে তাদেরকে ব্যবহার করার সুযোগ না পায়। সমগ্র প্রতিবেদনের যেখানেই উক্ত ধারণা বা পদাবলী ব্যবহৃত হবে সেখানেই সংজ্ঞার সাথে সংগতি রেখে তাদেরকে ব্যবহার করতে হবে। সংজ্ঞা প্রদানের উদ্দেশ্যই হব্বল গবেষক কি বিশেষ অর্থে কোন পদকে ব্যবহার করতে চান তা সুনির্দিষ্ট করা^৯। এমন অনেক পদ আছে যা সাধারণভাবে এক অর্থ প্রকাশ করে এবং যখন তা একাডেমিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় তখন তা ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। সেক্ষেত্রেও উক্ত পদকে যথার্থ সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করতে হবে। এমন অনেক ধারণা ও পদ আছে যাদেরকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা নিতান্তই কঠিন ব্যাপার। সেক্ষেত্রে প্রায়োগিক সংজ্ঞা (Operational definition) প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে স্পষ্ট করতে হবে যাতে গবেষক তাদেরকে কি অর্থে ব্যবহার করেছেন তা পাঠকের নিকট

অস্পষ্ট না থাকে। প্রায়োগিক সংজ্ঞা প্রদানের উদ্দেশ্যই হব্বল ধারণা বা পদকে বস্তুনিষ্ঠভাবে বোধগম্য করা। এভাবে গবেষণার ব্যবহৃত ধারণা ও পদের যথার্থ সংজ্ঞা প্রদান করলে পাঠকের পক্ষে গবেষণা কর্মটি বুঝতে এবং এর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে বেগ পেতে হয় না।

(গ) সহজ এবং সঠিক ভাষা

প্রতিবেদন লেখার কাজে ব্যবহৃত ভাষা সহজ-সরল, প্রাণবন্ত ও সঠিক হতে হবে যাতে পাঠকের পক্ষে প্রতিবেদনটি অনুধাবন করা সহজ হয়। পাঠকের শিক্ষাগত যোগ্যতা, আগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি সজাগ থেকে প্রতিবেদনে সে অনুযায়ী ভাষা ও শব্দাবলী ব্যবহার করতে হবে। প্রতিবেদন যদি কেবলমাত্র শিক্ষাবিদ বা সমাজ গবেষকদের জন্য প্রণীত হয়, তবে সে ক্ষেত্রে টেকনিক্যাল শব্দাবলী (Technical words) নির্দিধায় ব্যবহার করা যেতে পারে। একমাত্র উদ্ধৃতি (Quotation) ছাড়া গবেষণা প্রতিবেদনে জটিল, দুর্বোধ্য কিংবা আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার সমর্থনযোগ্য নয়। গবেষণা প্রতিবেদনের ভাষায় প্রধানতঃ অতীতকাল (Past tense) এবং তৃতীয় পুরুষের (Third person) ব্যবহার হয়^{১০}। সমগ্র প্রতিবেদনে একই প্রকার বানান ও রচনা রীতি ব্যবহার করা প্রয়োজন।

(ঘ) সুসৃঞ্জল উপস্থাপন

সমগ্র প্রতিবেদনটি এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লেখার মধ্যে একটি পূর্ণ সংগতি বজায় থাকে। পুরো প্রতিবেদনটি ধারাবাহিকতা বজায় রেখে উপস্থাপন করলে পাঠকের কাছে তা সুখকর পাঠ্য হিসেবে আবেদন রাখতে সক্ষম হয়। সমগ্র প্রতিবেদনটিকে কতকগুলো অধ্যায়ে এবং প্রতিটি অধ্যায়কে কতকগুলো অনুচ্ছেদে বিভক্ত করে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করতে হবে^{১১}। এভাবে বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংগতি সুনিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর সাথে সংগতিপূর্ণ একটি শিরোনাম এবং এর বিভিন্ন উপ-বিভাগের জন্য একাধিক উপ-শিরোনাম ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি অধ্যায়ের এবং

উপ-অধ্যায়ের শিরোনামের সাথে যেন বর্ণিত বিষয়বস্তুর সংগতি বজায় থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(ঙ) উদ্ধৃতি ও পাদটীকার ব্যবহার

প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রতিবেদনে উদ্ধৃতি ও পাদটীকার ব্যবহার করতে হবে। কোন স্বীকৃত গবেষকের অভিমত উল্লেখ করে বর্তমান গবেষণার বিষয়বস্তুর স্বপক্ষের যুক্তিকে আরো সুদৃঢ় করা অথবা কোন বিষয়ে কোন গবেষক কর্তৃক উপস্থাপিত বক্তব্য যদি একই রকম বা ভিন্ন রকম হয় তবে তা উদ্ধৃতির মাধ্যমে উল্লেখ করে বর্তমান আলোচনার ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। কোন বক্তব্যকে ভাষান্তর করলে বা পরিবর্তিত আকারে প্রকাশ করলে ভুল ব্যাখ্যা দেয়ার বা ভুল বুঝার যথেষ্ট অবকাশ থাকে। তাই সেক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতির ব্যবহার দরকার হয়। গবেষণা প্রতিবেদনে অত্যধিক সংখ্যায় কিংবা অতি দীর্ঘ উদ্ধৃতি ব্যবহার করা ঠিক নয়। কারণ, এতে পাঠক তাঁর ধৈর্য হারিয়ে ফেলতে পারেন এবং প্রতিবেদনের মূল বিষয়বস্তুর প্রতি তাঁর মনোযোগ বিনষ্ট হতে পারে।

উদ্ধৃতির উৎস পাঠককে অবগত করণের উদ্দেশ্যে পাদটীকা ব্যবহার করা হয়। উদ্ধৃতির পাদটীকা অনুসন্ধিৎসু পাঠককে মূল উৎস খুঁজে বের করে সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য লাভে সহায়তা করে। পাদটীকা যে সব সময়ই উদ্ধৃতির উৎস উল্লেখ করার জন্য ব্যবহৃত হয় এমন নয়। কোন লেখক বা গবেষকের কোন গ্রন্থ, গবেষণামূলক প্রবন্ধ, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি থেকে কোন বক্তব্য, ধারণা, যুক্তি বা ফলাফলের সহায়তা গ্রহণ করলে পাদটীকা বা গ্রন্থপঞ্জীতে তা উল্লেখ করতে হয়। পাদটীকা ও গ্রন্থপঞ্জীর ব্যবহার থাকলে উক্ত গবেষণা কর্মটি ব্যবহার করে পরবর্তীতে অন্যান্য গবেষক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে পরিচালিত গবেষণার কাজ সহজ উপায়ে সম্পাদন করতে পারেন।

(চ) প্রতিবেদনের আকার

প্রতিবেদনের গুণগত মান এর আকার বা আয়তনের উপর মোটেই নির্ভর করে না। কারণ একটি প্রতিবেদন আকারে বড় হ'লেই যে তা ভাল হবে এবং আকারে ছোট হ'লেই যে তার গুণগত মান দুর্বল হবে এমন কথার পেছনে কোন যুক্তি

নেই। একটি প্রতিবেদনের আকার তার প্রয়োজনানুযায়ী হওয়া উচিত, অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্বক কোন প্রতিবেদনের আকার বড় বা ছোট করা সমীচীন নয়^{২২}। সংগৃহীত তথ্যের উপস্থাপন, বিশ্লেষণ ও ফলাফল সন্নিবেশ করনের পাশাপাশি আনুষঙ্গিক আরো কিছু বিষয় ও পদ্ধতির বর্ণনা ও আলোচনার জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে যতটুকু আকারের প্রতিবেদন তৈরী করা দরকার হয়, প্রতিবেদনের বিস্তৃতি ততটুকুই হবে। এর সামান্য বেশীও নয়, আবার কমও নয়। শুধুই প্রতিবেদনের আকার বৃদ্ধির জন্য অযথা কোন বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করা, কিংবা অপ্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশ করা কোনটাই যুক্তি যুক্ত নয়। সাধারণত একটি প্রতিবেদনের আকার A4 সাইজের কাগজে সর্বনিম্ন ১০০ পৃষ্ঠা এবং সর্বোচ্চ ৩৫০ পৃষ্ঠার মধ্যে হওয়া ভাল। তবে এর সামান্য ব্যতিক্রমও হতে পারে।

(ছ) ত্রুটি স্বীকার

একটি সামাজিক গবেষণা বিশাল প্রক্রিয়া ও বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। তথ্য সংগ্রহে জটিলতা, বিশেষ করে নমুনায়নের ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটির সম্ভাবনা, সাক্ষাৎকার পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি কারণে সংগৃহীত তথ্যের নির্ভরশীলতা সব গবেষণায় সমান থাকে না। বিশেষ করে যে সব সামাজিক গবেষণা মাঠ পর্যায়ে অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় পরিচালিত হয়, তার নির্ভরশীলতার মাত্রা তুলনামূলকভাবে কম^{২৩}। গবেষণার ফলাফল শুধু গবেষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। পরবর্তীতে বিভিন্ন গবেষক অনুরূপ গবেষণা কর্মে তা ব্যবহার করতে পারেন; আবার উক্ত গবেষণার ফলাফল বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানকল্পে পরিচালিত কর্মসূচী প্রণয়নের ক্ষেত্রে দিক নির্দেশক হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে। গবেষণা প্রতিবেদনে এর ত্রুটি-বিচ্ছৃতি উল্লেখ না থাকলে ব্যবহারকারীগণ উক্ত গবেষণার ফলাফল নির্দিষ্টায় ব্যবহার করে বসতে পারেন, যার ফলাফল পরবর্তীতে অশুভ ও নেতিবাচক হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। তাই একটি উত্তম প্রতিবেদনে গবেষণার ভুল-ত্রুটির উল্লেখ করা একান্ত দরকার। পূর্ব থেকেই গবেষণার ফলাফলের সীমাবদ্ধতা ও ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে জানা থাকলে এর সমাধানে যত্নবান হওয়া যায় অথবা এর ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা সম্ভব হয়।

গবেষণা প্রতিবেদনের কাঠামো

গবেষণা প্রতিবেদন লেখার জন্য একক কোন স্বীকৃত কাঠামো নেই। তবে যে কোন ধরনের গবেষণা প্রতিবেদন লেখার সময় কতিপয় সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করা হয়ে থাকে। এই সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করে কোন প্রতিবেদন প্রণীত হলে তা একটি সার্বজনীন আকৃতি সম্বলিত প্রতিবেদনের রূপ লাভ করে; অর্থাৎ প্রতিবেদনটি চাহিদা অনুযায়ী পরিমিত কাঠামো লাভ করতে সমর্থ হয়।

একটি গবেষণা প্রতিবেদনের তিনটি অংশ থাকে। যথা :

(ক) প্রারম্ভিক অংশ

(খ) মূল অংশ

(গ) নির্দেশিকা

বৃহদাকার গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রতিটি অংশ আবার বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হয়ে থাকে। অপরপক্ষে, অতি ক্ষুদ্র প্রতিবেদন শুধু শিরোনাম পৃষ্ঠা ও মূল অংশ-এই দুইভাগে বিভক্ত হতে পারে^{১৪}। সাধারণভাবে কোন গবেষণা প্রতিবেদন লেখার সময় নিম্নোক্তভাবে গঠন কাঠামো অনুসরণ করা হয়। তবে বিশেষ প্রয়োজনে কোন নতুন অংশ এতে সংযোজিত হয়, আবার কোন কোন অংশ বাদ পড়ে যায়। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের পার্থক্য হেতুই এ ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

(ক) প্রারম্ভিক অংশ

১. শিরোনাম

২. গবেষক ও প্রতিষ্ঠানের নাম

৩. সার সংক্ষেপ

৪. ভূমিকা এবং/বা কৃতজ্ঞতা স্বীকার। কৃতজ্ঞতা স্বীকার ভূমিকার অংশ হিসেবে ভূমিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে; আবার আলাদাভাবেও প্রতিস্থাপনের রীতি প্রচলিত আছে।

৫. সূচিপত্র

৬. সারণী তালিকা

৭. মানচিত্র, রেখাচিত্র, ছবি ইত্যাদির তালিকা

(খ) মূল অংশ

১. সূচনা

১.১. গবেষণার সমস্যা বা বিষয়বস্তু

১.২. গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী

১.৩. গবেষণার উপপ্রমেয় বা অনুমান

২. গবেষণা পদ্ধতি

২.১. নমুনা

২.২. উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ ও যন্ত্রপাতি

২.৩. গবেষণার নকশা ও প্রক্রিয়া

৩. ফলাফল

৪. আলোচনা ও সুপারিশ

(গ) নির্দেশিকা

১. পরিশিষ্ট

২. তথ্য নির্দেশিকা

প্রতিবেদনের বিভিন্ন অংশের বিশ্লেষণ

(ক) প্রারম্ভিক অংশ

১. শিরোনাম : প্রতিবেদনের শিরোনামের মধ্য দিয়ে গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু প্রকাশ পাবে। এর অর্থ এই নয় যে, শিরোনামে গবেষণার প্রতিটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। শিরোনাম এমন হতে হবে যাতে শিরোনাম পড়েই বুঝা যায় সম্পূর্ণ প্রতিবেদনে কি বলতে চাওয়া হয়েছে। শিরোনামটি সঠিক, সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত হতে হবে। প্রতিবেদন ইংরেজীতে লেখা হ'লে শিরোনামটি সম্পূর্ণ Capital Letter-এ টাইপ করাই ভাল। নীচে গবেষণা প্রতিবেদনের কয়েকটি শিরোনামের উদাহরণ দেয়া হ'লঃ

INTER-COUNTRY COMPARISON OF PUBLIC ENTERPRISE PERFORMANCE : AN APPLICATION TO THE CEMENT INDUSTRY OF SOUTH ASIA

FOOD GRAINS DEMAND ELASTICITY OF RURAL HOUSEHOLDS IN BANGLADESH: AN ANALYSIS OF POOLED CROSS-SECTION DATA

STRUCTURAL CHANGE AND POVERTY IN BANGLADESH : THE CASE OF A FALSE TURNING POINT

মৌলিক জাতিগত স্বভাব বনাম অর্থনৈতিক উন্নয়ন : একটি তাত্ত্বিক আলোচনা

বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়ন : ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ কৌশল

২. গবেষক ও প্রতিষ্ঠানের নাম : শিরোনামের একটু নীচে একই পৃষ্ঠায় গবেষকের (বা গবেষকদের) নাম, প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা লিখতে হয়। কোন জার্নালে প্রকাশ করার জন্য লিখিত প্রতিবেদনে গবেষকের নামের সাথে তার ডিগ্রী বা শিক্ষাগত যোগ্যতা পদ বা পদমর্যাদা ইত্যাদি উল্লেখ করার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু ডিগ্রী লাভের জন্য লিখিত থিসিস-এর ক্ষেত্রে যেই ডিগ্রীর জন্য থিসিস লেখা হয় সেই ডিগ্রীর নাম উল্লেখ করা লাগে এবং থিসিস জমা দেয়ার সাল ও তারিখ উল্লেখ থাকে। ঠিকানা লেখার সময় অনেক ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্তাকারে লেখা হয় যেমন, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সমাজ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, খালিশপুর, খুলনা।

৩. সার সংক্ষেপ : গবেষণা প্রতিবেদনের এই অংশে গবেষণার মূল বিষয় অতি সংক্ষেপে (অনূর্ধ্ব তিন পৃষ্ঠা বা ৮০০ থেকে ১০০০ শব্দে) তুলে ধরা হয়^{১৭}। সার সংক্ষেপ পাঠের মাধ্যমে পাঠকবৃন্দ অতি অল্প সময়ে সমগ্র গবেষণা বিষয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত জ্ঞান লাভ করতে পারেন। সার সংক্ষেপ পাঠ করার পর কোন পাঠক যদি মনে করেন যে, সম্পূর্ণ প্রতিবেদনটি তাঁর পাঠ করা দরকার অথবা সম্পূর্ণ প্রতিবেদনটি পাঠ করার তাঁর প্রয়োজন নেই, তবে সেভাবে তিনি অগ্রসর হতে পারেন। সার সংক্ষেপে তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি, বিশ্লেষণ, মূল বিষয়ের বিবরণ এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞান সন্নিবেশিত হয়।

৪. ভূমিকা এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকার : গবেষক কেন বিষয়টির উপর গবেষণা পরিচালনা করতে আগ্রহী হলেন, এ সম্পর্কে গবেষকের বক্তব্য ভূমিকায় স্থান পায়। এছাড়াও, গবেষণার বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা এবং প্রতিবেদন সম্পর্কে গবেষকের মন্তব্য এ অংশে ব্যক্ত করা হয়।

বৃহদায়তনের গবেষণা প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নানাভাবে গবেষককে সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকে। তাই গবেষক প্রতিবেদনে সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। এই কৃতজ্ঞতা স্বীকার সাধারণত ভূমিকার মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রতিবেদনে ভূমিকা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা দেখা না দিলে, গবেষক সেক্ষেত্রে 'কৃতজ্ঞতা স্বীকার' শিরোনামে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকেন।

৫. সূচিপত্র : সূচিপত্র প্রতিবেদনের কোন পৃষ্ঠায় কি আছে তা ব্যক্ত করে। তাই কেবলমাত্র থিসিস বা বড় আকারের গবেষণা প্রতিবেদনে সূচিপত্র দিতে হয়। জার্নালে প্রকাশের জন্য লিখিত কোন প্রতিবেদনে বা অতি ছোট আকারের কোন প্রতিবেদনে সূচিপত্র দেয়ার দরকার হয় না। একটি বড় আকারের গবেষণা প্রতিবেদনের সূচিপত্রে অধ্যায়সমূহের নাম এবং অনেক ক্ষেত্রে উপ-অধ্যায়সমূহের নামও উল্লেখ করা হয়। অধ্যায় ও উপ-অধ্যায়সমূহের অবস্থান প্রতিবেদনের কত পৃষ্ঠায় তাও অধ্যায় ও উপ-অধ্যায়সমূহের বিপরীতে পৃষ্ঠা নম্বর প্রদানের মাধ্যমে সুনিশ্চিত করা হয়। সূচিপত্রে সাধারণতঃ ভূমিকা বা সমস্যার বিবরণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার, সংশ্লিষ্ট ও আনুষঙ্গিক গবেষণা, গবেষণার উদ্দেশ্য, আওতা, যৌক্তিকতা, গবেষণা পদ্ধতি বা উপাত্ত সংগ্রহ কৌশল, উপাত্ত বিশ্লেষণ, ফলাফল ও সুপারিশমালা ইত্যাদি বিষয়সমূহ উল্লেখ থাকে। এছাড়াও, ক্ষেত্র

বিশেষে সারণী তালিকা, চিত্র তালিকা, গ্রন্থপঞ্জী ও পরিশিষ্টের উপস্থাপনাও সূচিপত্রে স্থান লাভ করে। সূচিপত্রে উল্লিখিত শিরোনাম ও পৃষ্ঠা নম্বরের সাথে প্রতিবেদনের অন্তর্ভুক্ত শিরোনাম ও পৃষ্ঠা নম্বরের হুবহু মিল থাকা দরকার। অন্যথায় সূচিপত্র অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।

৬. সারণী তালিকা : গবেষণা সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ উপস্থাপনের একটি উল্লেখযোগ্য ও সুবিধাজনক পদ্ধতি হম্বল সারণী। একটি তথ্যবহুল বৃহদাকার গবেষণা প্রতিবেদনে একাধিক সারণী থাকতে পারে। বৃহদাকার প্রতিবেদনের মধ্য থেকে অতি সহজেই যাতে সংযোজিত সারণী খুঁজে বের করা সম্ভব হয়, সে-জন্য পূর্বেই সারণীর শিরোনাম ও পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ পূর্বক একটি তালিকা প্রস্তুত করে প্রতিবেদনে সংযোজন করা হয়।

৭. মানচিত্র, রেখাচিত্র, ছবি ইত্যাদির তালিকা : মানচিত্র, রেখাচিত্র, ছবি ইত্যাদির তালিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে সারণী তালিকা প্রস্তুত পদ্ধতির মত একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

(খ) মূল অংশ

১. সূচনা : সাধারণত একটি ভূমিকা প্রদানের মাধ্যমে মূল প্রতিবেদন শুরু হয়। প্রকৃতপক্ষে একে প্রতিবেদনের প্রথম অধ্যায় হিসেবে বিবেচনা করা যায়। ভূমিকা আকারে উপস্থাপিত প্রতিবেদনের সূচনা নামধারী এই অংশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সূচনায় আলোচিত বিষয় সংক্ষিপ্ত হম্বলে গবেষক অনেক সময় এর অধ্যায় নম্বর নাও দিতে পারেন। তবে একথা সত্য যে, সূচনায় অধ্যায় নম্বর দেয়া হোক আর না হোক, এটি প্রতিবেদনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ কারণেই সূচনা থেকে প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা নম্বর শুরু হয়। সূচনায় সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকে^{১৬}:

- সংশ্লিষ্ট গবেষণার পটভূমি-কেন বা কোন্ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট গবেষণার বিষয়টি নির্বাচন করা হয়েছে
- গবেষণা সমস্যার সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট সংগা প্রদান যাতে গবেষণা সমস্যা নিয়ে কারো কোন প্রশ্ন না থাকে বা কেউ ভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা প্রদান করতে না পারে

- গবেষণার উদ্দেশ্য
- প্রতিবেদনের ব্যবহৃত প্রত্যয় ও অনুমানসমূহ
- গবেষণার যৌক্তিকতা
- গবেষণার পরিধি ও সীমাবদ্ধতা
- গবেষণায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ
- তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে 'নমুনায়ন পদ্ধতি' ব্যবহৃত হ'লে সমগ্রকের বিশদ বর্ণনাসহ নমুনায়নের বিশেষ পদ্ধতির বিবরণ ও উক্ত বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণের পেছনে যুক্তি, নমুনার আয়তন নমুনার প্রতিনিধিত্বকারী যোগ্যতা, ত্রুটিসমূহ যাচাই ব্যবস্থা ইত্যাদির সুস্পষ্ট ও বিশদ বিবরণ দেয়ার দরকার হয়
- গুণাত্মক তথ্য বিশ্লেষণে ব্যবহৃত পরিমাপক পদ্ধতি

২. গবেষণা পদ্ধতি : প্রতিবেদনের এ অংশে সংশ্লিষ্ট গবেষণাকর্ম পরিচালনার জন্য যে উপযুক্ত পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয় তার বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা হয়ে থাকে। এখানে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকে :

- গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত নমুনা নির্বাচন পদ্ধতি, নমুনার আকার এবং বৈশিষ্ট্যসমূহ।
- তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে গৃহীত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি
- গবেষণা পরিচালনার মেয়াদকাল, বিশেষ করে তথ্য সংগ্রহে ব্যবহৃত সময়ের পরিমাণ এবং
- গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে অসুবিধাসমূহ, অর্থাৎ তথ্য সংগ্রহ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ, তথ্য শ্রেণীবদ্ধকরণ, উপস্থাপন, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে গবেষককে যে-সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে।
- গবেষণা পরিকল্পনা বা নকশা।

৩. ফলাফল : গবেষণা প্রতিবেদনের এ অংশে সংগৃহীত উপাত্তসমূহকে বিভিন্ন

গাণিতিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে সেগুলোর সারসংক্ষেপ ছক বা চিত্রের সাহায্যে উপস্থাপনের মাধ্যমে অধিকতর সহজবোধ্য করে তোলা হয়। তবে ছক বা চিত্রের ব্যবহার মূলত নির্ভর করে সংগৃহীত তথ্যের বৈশিষ্ট্যের উপর। উপাত্তের সার সংক্ষেপ বর্ণনা করাই ছক বা চিত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। উপাত্ত উপস্থাপনের প্রচলিত বিভিন্ন কৌশলের পাশাপাশি আরও নতুন নতুন কৌশল দিন দিন সংযোজিত হচ্ছে। এ সব কৌশলসমূহ থেকে উপযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য কৌশল বাছাই করে নিতে হয়। গবেষককে স্মরণ রাখতে হবে যে, কোন উপস্থাপন কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে গবেষণা ফলাফলকে সব থেকে সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে। সারণী, রেখাচিত্র বা মানচিত্রের আকার যদি বৃহৎ হয় এবং সেগুলো যদি অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হয়, তবে সে ক্ষেত্রে সেগুলোকে প্রতিবেদনের মূল অংশে সংযোজন না করে পরিশিষ্টে সংযোজন করাই ভাল। তবে তথ্যের আলোচনার স্থানে ঐ তথ্য সম্পর্কিত সারণী, রেখাচিত্র বা মানচিত্র পরিশিষ্টের কত পৃষ্ঠায় উপস্থাপিত হয়েছে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকা দরকার যাতে পাঠক ইচ্ছে করলেই সংশ্লিষ্ট সারণী, রেখাচিত্র বা মানচিত্রটি দেখতে পারেন। গবেষণা ফলাফলের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কিত তথ্যও প্রতিবেদনের এ অংশে উপস্থাপিত হয় যাতে পরবর্তীতে গবেষণার ফলাফল ব্যবহারের ক্ষেত্রে পাঠক সতর্কতা অবলম্বন করতে পারেন^{১৭}।

৪. আলোচনা ও সুপারিশ : প্রতিবেদনের এ অংশে গবেষণা ফলাফলের ব্যাখ্যা করে সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়। সংশ্লিষ্ট গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে অনুরূপ অন্যান্য গবেষণার ফলাফলের কোন সামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয় কিনা তা জানার জন্য এদের তুলনা রাখা হয় এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রচেষ্টা গৃহীত হয়। এছাড়াও, প্রাপ্ত ফলাফলের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিকগুলো বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়। এর অর্থ এই যে, গবেষণা ফলাফল নতুন কোন তত্ত্ব বা জ্ঞানের দিক নির্দেশনা দেয়, অথবা প্রতিষ্ঠিত কোন তত্ত্বকে সমর্থন দান করে-সে বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়^{১৮}। প্রাপ্ত ফলাফল বাস্তব জীবনের কোন সমস্যা সমাধানে ব্যবহৃত হতে পারে কিনা সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়। গবেষণা ফলাফল পূর্বে নির্ধারিত গবেষণা উপপ্রমেয় সমর্থন করে কিনা, না করলে তার কারণ কি ইত্যাদি সম্পর্কেও এ অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়। গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন ভুল-ত্রুটি সংঘটিত

হয়। এ অংশে তা বর্ণনা করা হয়ে থাকে। গবেষণা বিষয়ের যে-সব ক্ষেত্রে পরবর্তীতে গবেষণা পরিচালনার সুযোগ রয়েছে সে-সব ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কেও এখানে আলোকপাত করা হয়।

(গ) তথ্য নির্দেশিকা

১. **পরিশিষ্ট :** গবেষণা পরিচালনার জন্য সংগৃহীত যেসব তথ্য-প্রমাণ এবং বিভিন্ন প্রকার উপকরণ প্রতিবেদনের মূল অংশে সরাসরি সংযোজন করা সম্ভব হয় না, সেগুলোকে প্রতিবেদনের পরিশিষ্টের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। অনেক সময় সারণী, রেখাচিত্র বা মানচিত্রের আয়তন অনেক বড় হ'লে এবং তা বেশী মাত্রায় ব্যবহৃত হ'লে সেগুলোকে প্রতিবেদনের মূল অংশে উপস্থাপন না করে পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এতে প্রতিবেদনটি সুখপাঠ্য ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠে। তাছাড়া, ভবিষ্যতে অন্য কোন গবেষকের ব্যবহারে লাগার আশায়ও অনেক তথ্য-প্রমাণ ও অশোধিত উপাত্ত গবেষক পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত করেন^{১৯}।

২. **গ্রন্থপঞ্জি :** গবেষণা প্রতিবেদন লিখনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার বই-পুস্তক, জার্নাল, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। এসব বই পুস্তক, জার্নাল বা পত্র-পত্রিকা ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য হ'ল উপস্থাপিত তথ্যের ভিত্তি মজবুত করা।

প্রতিবেদনের এ অংশে বই-পুস্তক এবং প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গবেষণামূলক প্রবন্ধের লেখকদের নাম বর্ণমালা অনুসারে (Alphabetically) লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রত্যেক লেখকের নামের পর তাঁর প্রবন্ধ বা বই-পুস্তকের নাম, প্রকাশকের নাম, প্রকাশনার স্থান, সন ইত্যাদি তথ্যসমূহ নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে লিপিবদ্ধ করা হয়। তবে গ্রন্থপঞ্জি সম্পর্কিত তথ্যাবলী লিপিবদ্ধ করার নিয়ম গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং জার্নাল ভেদে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। নিম্নে এর কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হ'লঃ

George A. Akerlot and Janet L. Yelled (eds). **Efficiency Wage Models of the Labor Force**. London : Cambridge University Press, 1986, "Introduction", pp. 1-21.

John R. Harris and Michael P. Todaro. **"Migration, Unemployment and Development : A Two-Sector Analysis"**,

American Economic Review, 60 March 1970), pp. 126-142.

মান্না, এম, এ, *বিপন্নন যুগে যুগে*, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৮, রয়েল লাইব্রেরী, ঢাকা, পৃঃ ৪৫, ৫৪।

ইসলাম টি, (১৯৮৮) : *ইসলামী পদ্ধতিতে বিনিয়োগ ও সমস্যা ও সমাধান*। ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং, আঞ্চলিক সেমিনার IERB-এর সৌজন্যে, ঢাকা।

প্রতিবেদনের রূপ নিরূপণ সংক্রান্ত সুপারিশমালা

প্রতিবেদনের রূপ সত্যিকার কেমন হবে তার কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। তবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রতিবেদন তৈরী করলে প্রতিবেদনটি একটি যথার্থ প্রতিবেদনের রূপ পাবে বলে আশা করা যায় :

- প্রতিবেদন বাস্তবসম্মত হওয়া দরকার। গবেষণার উদ্দেশ্যানুযায়ী সংগৃহীত বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের উপর ভিত্তি করে বাস্তবসম্মতভাবে ইহা প্রণয়ন করতে হবে। কেউ যদি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় বা তথ্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন, তবে তিনি আন্তরিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা অনুসন্ধানের মাধ্যমে তার যথার্থতা যাচাই করতে পারেন।
- প্রতিবেদনটিকে একটি পরিপূর্ণ রূপ পেতে হবে। অর্থাৎ ইহা যেন একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনের রূপ নেয়। এর অর্থ হব্বল গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যানুযায়ী সব প্রয়োজনীয় বিষয়ই যেন এতে অন্তর্ভুক্ত থাকে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কোন কিছুই যেন আলোচনা থেকে বাদ না যায়।
- প্রতিবেদন যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত হওয়া দরকার। ইহা বিশাল আকারে হ'লে পাঠকের মনোযোগ বিনষ্ট হতে পারে। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ আলোচনা থেকে বাদ দিয়ে এর আয়তন ছোট করতে হবে।
- গবেষককে বুদ্ধিগত দিক থেকে সৎ (Intellectually honest) থাকতে হবে। তাঁর জানা মতে তিনি কখনোই মিথ্যা বা ভুলের প্রশ্রয় দিবেন না।

- প্রতিবেদনটি সুখপাঠ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহা এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে তা পাঠক মনে আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। পাঠক মনে আগ্রহ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হলে প্রতিবেদনে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও তা পাঠকের কাছে চির অজানাই রয়ে যাবে।
- প্রতিবেদনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি ধারাবাহিকতা বজায় থাকা উচিত। এর কোথাও যেন কোন প্রকার ছন্দপতন না ঘটে। প্রত্যেক অধ্যায় ও উপ-অধ্যায়ের মধ্যে সংগতি রেখে প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে, যাতে সংশ্লিষ্টতার অভাবে পাঠকের মনোযোগ বিনষ্ট না হয়।

সুপারিশমালা

প্রবন্ধের আলোচনায় একথা মূর্ত হয়ে উঠেছে যে, গবেষণা প্রতিবেদন লিখন একটি জটিল এবং কষ্টসাধ্য ব্যাপার। পাঠকের নিকট গবেষণাকর্ম বা গবেষণার ফলাফল পৌঁছায় প্রতিবেদন আকারে। তাই প্রতিবেদন লেখার গুরুত্ব অপরিসীম এবং এটি যাতে যথার্থ এবং পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে তার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশমালা পেশ করা হলো :

- ক. গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধানের পর সংগৃহীত তথ্য ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিবেদন তৈরীর কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে
- খ. প্রতিবেদন লেখার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কোন বিশেষ শ্রেণীর পাঠকের উদ্দেশ্যে তাম্রপ্রণীত হলে সেটি তাদের উপযোগী হচ্ছে কিনা
- গ. প্রতিবেদন নতুন জ্ঞান ও তত্ত্ব প্রকাশের পাশাপাশি সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে কিনা সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে
- ঘ. প্রতিবেদনে গবেষণা সমস্যার সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করতে হবে যাতে গবেষণার সমস্যা নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন না থাকে বা কেউ ভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা দিতে না পারে

- ঙ. প্রতিবেদন যাতে পাঠকের মনে আবেদন সৃষ্টি করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে
- চ. প্রতিবেদনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি যুক্তিপূর্ণ ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে
- ছ. পাঠকবৃন্দ যেন গবেষকের কোন প্রকার সাহায্য ছাড়াই উপস্থাপিত তথ্যসমূহ এবং গবেষণার ফলাফলের তাৎপর্য ও ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে
- জ. গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে অনুরূপ গবেষণার ফলাফলের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও সম্পর্ক নির্ণয় করতে হবে এবং
- ঝ. গবেষণালব্ধ ফলাফলের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে হবে।

পাদটিকা ও তথ্য নির্দেশিকা

Berenso, Canard, and Colton, Raymond (1971), **Research and Report Writing for Business and Economics**, Random Press, New York.

Ghosh, B. N. (1982), **Scientific Methods and Social Research**, Sterling Publishers Pvt. Ltd., New Delhi.

রউফ, কাজী আবদুর ও ইলাহী, মউদুদ (১৯৯৩), **সামাজিক বিজ্ঞানে গবেষণা**, পদ্ধতি, সূজনেষু প্রকাশনী, ঢাকা।

Kothari, C. R. (1994), **Research Methodology**, New Age international Limited, India.

বেগম, নাজমির নূর (১৯৯২), **সমাজ গবেষণা পরিচিতি**, বুক হাউস, ঢাকা।

Tandon, B. C. (1979), **Research Methodology in Social Science**, Chaitanya Publishing House, Allahabad.

Acoff, R. L. (1953), **The Design of Social Research**, University of Chicago Press, Chicago and London.

মালেক, আবদুল, সরকার, নীহাররঞ্জন ও রহমান, আজিজুর (১৯৯০), **সমাজ বিজ্ঞানে গবেষণা পদ্ধতি**, হাসান বুক হাউস, ঢাকা।

Negel, Stuart S. and Neef, Marion (1979), **Policy Analysis in Social Science Research**, Sage Publications, London.

Emory, C. William (1976), **Business Research Methods**, Retard D. Irwin, Inc. Homeward, Illinois.

Ferber, R. and Verdooom, P. J. (1962), **Research Methods in Economics and Business**, The Macmillan Company, New York.

Williamson, J. and carp, D. (1977), **The Research Craft : An Introduction to Social Science Methods**, Little-Brown, Boston.

Freedman, P. (1960), **The Principles of Scientific Research**, 2nd ed., Persimmon Press, New York.

Gopal, M. H. (1964), **An Introduction to Research Procedure in Social Science**, Asia Publishing House, Bombay.

Tandon, B.C. (1979), **Research methodology in Social Science**, Croitanya Publishing House, Allahbad

Rose, Reanold Marshall (1954), **Theory and Methods of the Social Science**, University of Minnesota Press, Minneapolis.

রহমান, হাবিবুর (১৯৯০), **সমাজ বিজ্ঞান পরিচিতি**, হাসান বুক হাউস, ঢাকা।

Mossier, C. A. and Clayton, G. (972), **Survey Methods in Social Investiga-tion**, Basic Books, New York

তপন, শাহজাহান (১৯৮৭), **অ্যাসাইনমেন্ট ও থিসিস লিখন : পদ্ধতি ও কৌশল**, হাসান বুক হাউস, ঢাকা।